International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

যামিনী রায়ের চিত্রকলা: লোকচিত্র থেকে আধুনিক চিত্রে উত্তরণ

ড. কুন্তল সিনহা
সহকারী অধ্যাপক, যামিনী রায় কলেজ

যামিনী রায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। চিত্র সমালোচক অশোক মিত্র বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর লেখা ও গানের মধ্যে দিয়ে এযুগে সারা বাঙালী জাতির এবং কতকটা ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার, মনের সরঞ্জাম ও তার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দিয়ে গেছেন, যামিনী রায় তেমনি তার ছবির সাহায্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের রঙে, ডিজাইনে প্রগাঢ় ছাপ রেখেছেন'।[১]

যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। তাঁর বিরাট শিল্প বৃক্ষের শিকড় জড়িয়ে রয়েছে মূলত এই গ্রামে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে বিকশিত হলেও গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি তখনও ছিল অবিকৃত। নাগরিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনের দিনেও 'জড়ানো পট, যাদুপট, চৌকো পট, লক্ষীর সরা, আহ্লাদি পুতুল, কাঠের পুতুল, শোলার খেলনা, এবং দেবদেবীর প্রতিমা ইত্যাদির ঐতিহ্যে কোন ভাঁটা পড়েনি'। শতাব্দীর পর শতাব্দী আগলে রেখেছিল। বাঁকুড়ার বষ্ট গ্রাম ও বেলিয়াতোড়ের অধিবাসীদের জীবনাচরণ, জীবিকা, ধর্মাচরণ, সাংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা, পার্বণে মাটি ও মানুষের আশ্চর্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কামার, কুমোর, মৃৎশিল্পীরা এখানকার মৃত্তিকা জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারুশিল্পীরা এখানকার লোক অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন সামগ্রী, এমনকি শিশুদের খেলার পুতুলের যোগান দিত। এছাড়া বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে নানারকম পোড়া মাটির পুতুল, জ[স্জানোয়ার, পাঁচ মুড়ার ঘোড়া প্রভৃতি ছিল বিখ্যাত।

যামিনী রায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরে এইসব কারুশিল্পের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন। তিনি তাঁতির তাঁত বোনা, চাকায় কুমোড়ের হাঁড়ি গড়া, বেত আর বাঁশের কারিগরদের ধামা বাঁধা, মাদুর বোনা, মৃৎ শিল্পীদের মূর্তি তৈরি, পুতুল, খেলনা তৈরি দেখে আশ্চর্য হতেন। মেয়েদের গান গাইতে গাইতে ঢেঁকিতে পা দেওয়া, পূজা-পার্বণে আল্পনা দেওয়া, বসুধারার ছবি আঁকা মুগ্ধ হয়ে দেখতেন।

পোটোদের জড়ানো পটের সঙ্গে গান শুনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতেন তিনি। রামায়ণ, মহাভারতের কথা, পুরাণের কথা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধুর্য রসে মোহিত হতেন। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষদের পাশাপাশি সাঁওতাল ও নানা আদিবাসী জনজাতির মানুষদের বসবাস রয়েছে। তাদের নাচ-গান ও সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি ছোট থেকেই পরিচিত ছিলেন। এছাড়া বেলিয়াতোড়ের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও অত্যন্ত গৌরবের। এখানে ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব ও মেলা বিখ্যাত। মনসা পূজা ও ভাদু পূজা এখানকার লোক উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভাদু পূজাকে কেন্দ্র করে নানা মূর্তি তৈরি হয়, যেমন মেমসাহেব ভাদু, হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভাদু ইত্যাদি, এছাড়া বাউড়ি উৎসব, শিকার পরব এবং মনসা পূজার সময় ঝাঁপান উৎসব প্রচলিত ছিল। এইভাবে যামিনী রায়ের শিল্পী মন বাঁকুড়া -বেলিয়াতোড়ের উদার ও ঐতিহ্যশালী লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রসদ সংগ্রহ করে পুষ্টু হচ্ছিল প্রতিদিন।

তিনি প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হন। এখানে তিনি ওয়েস্টার্ন অ্যাকাডেমিক আর্টস বিভাগে ভর্তি হন। তিনি এলাহাবাদে রঙিন ছবির মিশ্রণ সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর কলকাতার একটি রঙিন ছাপাখানায় মিশ্রণ সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলকাতার রঙিন লিথোগ্রাফিক প্রেসেও তিনি কাজ করতেন। অর্থের প্রয়োজনে এক ইহুদি ব্যবহায়ীর জন্য রঙিন গ্রিটিংস কার্ড আঁকার কাজও করেছেন তিনি। এমনকি এক সময় কাপড়ের দোকানেও কাজ করেছিলেন। মানুষের পেশা ও জীবনযাপনের ওপরে জামা কাপড়ের রঙের পছন্দ অপছন্দ নির্ভর করে, এখানে কাজ করে তিনি তা বুঝেছিলেন। থিয়েটারে সিন এঁকেও তিনি অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এইভাবেই বাস্তবের তাগিদে নানা পেশাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর শিল্পী মন ও হাত দুটোই ধীরে ধীরে ঋদ্ধ ও শক্তিশালী হতে থাকে।

এরপর তিনি পুরোপুরি ছবি আঁকায় মন দেন। তিনি প্রথমে ইউরোপীয় রীতির জটিলতাকে অবলম্বন করে চিত্র রচনা করলেও পরবর্তীতে দেশজ রীতিকে আশ্রয় করে চিত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চিত্রাঙ্কণের মূল উৎস ছিল লোকচিত্র। লোকশিল্পের অন্যতম শাখা লোকচিত্র কলার তিনটি প্রধান ভাগ হল, ১) পট বা বহুবিধ জড়ানো পটচিত্র, ২) দেওয়ালে অঙ্কিত রঙিন চিত্র ও গৃহতলে আঁকা আল্পনা, ৩) চিত্রিত কাষ্ঠ ও মাটির পুতুন শিল্প। গ্রামীণ মানুষদের দ্বারা এখনও পর্যন্ত অনুশীলিত এই তিনটি লোকচিত্র শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল,

বহুবিধ জড়ানো পটশিল্প, যা বাংলার গ্রামীণ লোকচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। যামিনী রায় তাঁর 'পটুয়া শিল্প' প্রবন্ধে পটশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চিত্রকলা বাংলাদেশে দুরকম ভাবে প্রচলিত ছিল যথা ১) ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, ২) পালা পার্বনের শিল্প বা পোশাকী শিল্প। আটপৌরে ছবির মধ্যে পটের ছবি রয়েছে এবং পালা পার্বণের শিল্পের মধ্যে দেবমূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টঃ প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত, তাতে আভিজাত্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। তিনি পটশিল্প সম্পর্কে বলেছেন—'যে ছবি আসল পটুয়া ছবি, ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে, কলকাতা শহর গড়ে উঠবার অনেক আগে, বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল, তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল'।[২]

যে কোন দেশের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত ও প্রচলিত ধ্রুপদী রীতিনীতি মূল্যবোধকে আদর্শ হিসেবে ধরেই যে কোন শিল্প সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হত। ফলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেশীয় লোকসংস্কৃতিকে দীর্ঘ সময় অবহেলার চোখে দেখা হয়েছিল। ইউরোপে একসময় গ্রীক শিল্পাদর্শকেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখা হত। তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশীয় লোকজ শিল্প ছিল গ্রাম্য, অশ্লীল, অসংস্কৃত। ফলে আফ্রিকা, এশিয়ার লোকসংস্কৃতি ছিল তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য সমাজের কাছে অস্পৃশ্য ও উপেক্ষার বিষয়। ছোট, বড় কোন সংগ্রহশালাতেই লোকজ শিল্পের স্থান হয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইউরোপে চিন্তার জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই এর মতে 'অবশেষে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রিক ক্লাসিক্যাল শিল্পের অধিকার ক্রমশঃ শিথিল হওয়া নতুন নতুন মূল্যবোধের সংযোজনের আফ্রিকা ও মেক্সিকো আর্টের অন্তর্নিহিত সত্তা পাবলো পিকাসো, পল ক্লে, হেনরি মুর প্রমুখ শিল্পীদের কাছে একটি নির্ভেজাল আদিম শক্তিমত্তার উদ্ভাসিত হয়। শিল্পজগতে দ্রুত নব নব আঙ্গিকের সংযোজন আরম্ভ হয়।"[৩]

আমাদের দেশেও প্রথমে ইউরোপীয় রিয়ালিজম এবং ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পাদর্শের নিরিখেই যাবতীয় শিল্পকর্মকে বিচার করা হত। দেশীয় লোকজ শিল্পকে নিম্নমানের শিল্পকর্ম হিসেবে হেয় করা হত। যামিনী রায়ের যখন চিত্র জগতে

আবির্ভাব তখন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে স্পষ্টত দুটো ধারা প্রবাহিত। একদল চিত্রকর পাশ্চাত্যের রিয়ালিজমের আদর্শে এদেশেও বাস্তববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর একদল চিত্রকর স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁরা প্রাচ্য গৌরবেরও পুনরুদ্ধার চান। তাই চীন, জাপান, স্বদেশের অজন্তা, মুঘল, রাজপুত চিত্র এবং দেবদেবীর ভাস্কর্যের অনুকরণে তাঁরা ভারত-শিল্পের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন।[৪] প্রথমে যামিনী রায় রিয়ালিজম, ইমপ্রেশনিজম এবং অবনীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে চিত্র রচনা করলেও, দীর্ঘদিন তিনি সে পথ হাঁটেননি। অথচ নিরন্তন আত্মপ্রকাশের তাগিদে এরপর থেকে তিনি দেশীয় লোকজ সংস্কৃতির জগতে ফিরে তাকান।

তিনি পট নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। বাঁকুড়া, বেলিয়াতোড় ছাড়াও মেদিনীপুর, কলকাতার কালীঘাট থেকে তিনি প্রচুর পট সংগ্রহ করেন। পটকে অনুসরণ করেই তিনি শেষ পর্যন্ত নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। পটুয়াদের ছবি থেকে শিক্ষা নিয়ে চিত্রকলার আদিমতম ও শুদ্ধতর রূপের আবিষ্কারে ব্রতী হন। চিত্রের গড়ন নয়, দ্বিমাত্রিকতার পরিপূর্ণতাই তাঁর চিত্ররীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। পটচিত্রের মধ্যে তিনি নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করলেন। যার মূল ভিত্তি ছিল লোকায়ত সহজিয়া চেতনা। এই চেতনাকে মননে ধারণ করেই তাঁর চিত্র অনুশীলনের কঠোর তপস্যা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে শ্রেষ্ঠ শিল্পীতে তাঁর রূপান্তর ঘটে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন যামিনী রায়ের বাংলার লোকশিল্পের প্রতি অদম্য আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার মূলে দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন,প্রথমত, লোকশিল্প কলায় স্বাভাবিক অনাড়ম্বর সরলতা, অভিব্যক্তির সোজা তথা অব্যবহিত ভাব, ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতা দ্বিতীয়তঃ, তার আঙ্গিকের গঠন।

ট্রাডিশনাল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কাজ করার পর তিনি শিল্পের ভাষা, পদ্ধতি, প্রয়োগ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। অবশেষে বাংলার লোকশিল্পের মধ্যেই তিনি তাঁর বহু আকাঙ্খিত ভাষা আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিল্প রচনার উপাদান খুঁজে পেলেন বাংলার মাটির পুতুলে, পটচিত্রে, কুমোরের মাটির তৈরি হরেক জিনিসে, প্রতিমার গড়নে, পোড়ামাটির মন্দিরের কারুকার্যে। তিনি লোকশিল্পের আতিশয্যহীন, অলংকারহীন রূপকল্পনার পথে হাঁটলেন ছবিকে রিয়ালিস্টিক ভাবে না এঁকে 'কেবলমাত্র সুনিপুণ রেখা এবং সহজ বর্ণের ব্যবহার করে ছবির বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা দেওয়া'র চেষ্টায় চিত্র শিল্পী ইন্দ্র দুগার বলেছেন 'প্রকৃতপক্ষে একে অনুসরণ না বলে লুপ্ত পথের পুনরুদ্ধার বলাই শ্রেয়। কারণ এই

লোকশিল্প ফটোগ্রাফি গুণাবিশিষ্ট সমগ্র শিল্পরচনা থেকে এত স্বতন্ত্র, অথচ মৌলশিল্প আবেদনে পরিপূর্ণ যে সেই আকর্ষণই তাঁকে শিল্পরচনার নতুন পথের সন্ধান এনে দিলো'।[৫]

বিষ্ণু দে তাঁর 'যামিনী রায়' প্রবন্ধে বলেছেন তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উজ্জল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈতন্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায়, তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙিন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্য, যে ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা'।[৬]

যামিনী রায় প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে অনুসরণ করে চিত্র রচনা করলেও সেই সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন বাঁকুড়া জেলার পটচিত্রকে অনুসরণ করে চিত্র রচনা শুরু করলেন, তখন তা যেন এক অভিনব সৃষ্টি রূপে প্রকাশ পেল। স্বসৃষ্টির নতুন আলোয় নিজেকেই যেন খুঁজে পেলেন তিনি। যেখানে তাঁর জন্ম, যে লাল মাটির শক্ত ভূমিতে তিনি প্রথম পা রাখতে শিখেছিলেন, যে প্রাচীন পটচিত্র দেখতে দেখতে তাঁর দৃষ্টি ও দর্শন গড়ে উঠেছিল, যে লোকজ সংস্কৃতি তাঁর দেহের রক্তে প্রবাহিত, সেই জন্ম লালিত লোকশিক্ষাই তাঁর স্বতন্ত্র সৃষ্টির উৎস। তিনি পটকে অনুসরণ করে চিত্র রচনা করলেও, তাঁর চিত্র ছিল গ্রাম্যতা মুক্ত, পটচিত্রের পুনরাবৃত্তি দোষমুক্ত সম্পূর্ণ আধুনিক চিত্র। পটচিত্র তাঁর ছবির প্রধান প্রেরণা হলেও পটের ছবির অসংস্কৃত তারল্য তার ছবিতে ছিল না। আধুনিক প্রতীচ্য শিল্পের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, আকারে বিশুদ্ধতা এবং আদিম রূপকলার প্রতি আকর্ষণ তা তাঁর ছবিতে প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা গিয়েছিল। সামঞ্জস্য ও সংযম যদি হয় ভারতীয় মৌলিকতার প্রধান শর্ত তবে তাঁর ছবির 'সৌন্দর্য বৃদ্ধির মূল এদেশের ধর্মবোধের গভীরে প্রোথিত'। তাঁর শিল্প জীবনের প্রথম দিকে সাঁওতাল মেয়েদের বা পুরুষদের মনোরম ছবিগুলি, কৃশ বাংলার মেয়ে, বাহুতে ছেলে ইত্যাদি বিখ্যাত।

কালিঘাটের নিম্নরুচির শহুরে রসিকতার চিত্র চিন্তা থেকেও তার চিত্র ছিল মুক্ত। এসবই তাঁর চিত্রে ঘটেছিল বিবাদহীন শান্তিপূর্ণ উপায়ে। ধর্ম এখানে জীবনের অঙ্গ হয়ে রইলো, কিন্তু মহাজনের ভূমিকায় খবরদারি করতে এলো না। তাঁর বিখ্যাত চিরন্তন মাতৃরূপ কল্পনা, কৃষ্ণ, খ্রিষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মাহাপুরুষেরা তাঁর চিত্রে একে অপার্থিব অকপট শান্ত সুষমার প্রতিমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন।

চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছেন—'যারা চিত্র কর্মে আছেন তারা জানেন, চিত্রপটকে সুচারুভাবে বিভাজন করে অল্প প্রয়োজনে সাজানো কতটা দুরূহ কাজ। অথচ যামিনী বাবুর চিত্র দেখলে মনে হয় এগুলো কত সহজেই না ঘটেছে। এটা সম্ভব তার পক্ষেই যিনি অপরিসীম অনুশীলনে এক অকল্পনীয় দক্ষতাকে আয়ত্ব করেছেন। এদেশের চিত্রকল্পের একটি বড় লক্ষণ তার আলঙ্কারিক ভঙ্গিমা বা SDecorative manner ây attitudeV, এটা যামিনী বাবু এই বিশেষ লক্ষণটিকে তাঁর চিত্রকল্পে এনেছেন কিন্তু কি অত্যাশ্চার্য সংযমের সঙ্গে। বাহুল্য নামক কোন কিছুই তাঁর চিত্রকল্পে স্থান পায়নি।[৭]

আধুনিক চিত্রশিল্পী সম্পর্কে বহু অনুশীলন ও অধ্যয়ন করার পর চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন দুটি উপলব্ধি করেছেন, যথা—১) এযুগের ইউরোপীয় বিপ্লবী শিল্পকলার মূলে যে অনুসন্ধান ছিল তা হল আঙ্গিকের মহত্ব এবং ভূমিকা, ২) শিল্পকলা শুধু ইনটুইশন বা ইনস্টিংক্টেরই নয়, বুদ্ধির প্রধান্য। শিল্প বলতে তিনি মনে করেন গাছ, ফুল, পাখি, চাঁদ যাই আঁকা হোক না কেন তা বাস্তবের হুবহু কপি হবে না, তা হবে 'শিল্পীর দিব্যদৃষ্টির স্বরূপের প্রতিফলন'। তিনি লক্ষ্য করেছেন যামিনী রায়ের শিল্প এবং পাশ্চাত্য শিল্প উভয়ের মধ্যে ফর্মভিত্তিক একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই যামিনী রায়ের চিত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনিই প্রথম যিনি লোকজ শিল্পের অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যবর্জিত সমাহিত অখণ্ডের সাড়া অনুভব করেন এবং অনুভুত এই আঙ্গিকের প্রতি দ্বিধাহীন অবিচলিত থাকেন। যামিনী রায় শুরুতে রিয়ালিজমের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু রিয়ালিজমের মায়াময় ইলিউশনের চেয়ে দেশজ অমিশ্রিত সমদ্যোতক ফ্ল্যাট রঙের ভারি প্রলেপ ও সরলীকৃত ছন্দিত রেখার গতিময়তা ও আঙ্গিকে বিন্যস্ত ছবি, যেমন ফ্ল্যাট অস্পষ্টতা, জটিলতা ও বাহুল্যবর্জিত নগ্ন, ভাসমান হয়েও দৃশ্যগত 'লিনিয়ার পারস্পেক্টিভ' ও আলো-আঁধারির রাখঢাকের গভীরতার চেয়ে আমাদের মনকে এনে অচেনা ভাবাবেগে নিমজ্জিত করায়। এ কথা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর বিস্তীর্ণ ক্যানভাসের প্রেক্ষাপটে মা ও শিশুকে যখন দেখি, নির্দিষ্ট কোন নাম, দেশ ও কালের অতীত রাফায়েলের বিখ্যাত চিত্র 'ম্যাডোনা ও শিশু'র চাইতেও বেশি বিশ্বজনীন মাতৃত্বের রূপ আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তেমনি 'বিড়ালী ও শাবক', 'হস্তিনী ও শাবক' ছবিগুলিতে অখণ্ড মাতৃরূপ দেখি। কার্যরত 'কাঠের মিস্ত্রি'র পেশাগত দক্ষতার প্রশান্তি, 'নিবেদন' ছবিটিতে বর্ষাস্নাত পরিচ্ছন্নতা। এমনি

সীমাহীন বিস্তারের অভিব্যক্তি সব ছবিকে আশ্রয় করে থাকে।[৮]

চিত্রকলার অন্যতম শর্ত হিসেবে ধরা হয় ভিস্যুয়াল এলিমেন্ট বা দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতাকে, যা যামিনী রায়ের চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের ভাষায় এতদিন দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতির উপরে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গঠনগত উপাদানের উপর গুরুত্ব না দিয়ে চিত্রের মূল্য নির্ধারণে ভাবের কল্পনাকে প্রধান হিসেবে ভাবা হয়েছে। অথচ পশ্চাত্য শিল্প রসিকরা মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান তথা গঠনগত উপাদানের খোঁজেই ভারতীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখিছিলেন। বিকাশ ভট্টাচার্যের কথায়, 'যামুনী বাবুর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্যও এই Visual Elementôএর এক অভিনব বিন্যাসে মণ্ডিত হয়ে আছে।'[৯]

যামিনী রায়ের প্রতিটি ছবির সৌন্দর্য্যের পেছনে একটি নিখুঁত জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। তাঁর ছবির প্রধান অবলম্বন গতিময় রেখা। যে রেখা গভীর মানসিক অভিব্যক্তি সম্পন্ন ও সংকেতময়। তাঁর রেখার গতি এমনই যে, 'দর্শকের মন ছবির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহিঃর্দেশ কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না, পটের মধ্যেই আনাগোনা করে, নিবদ্ধ থাকে। পটের কেন্দ্রবিন্দুই সেই রেখা রচনার আসল অভীষ্ট।'

তিনি বলেছেন আমাকে রাস্তা খুঁজতে নিজের মধ্যেও অন্বেষণ করতে হয়েছে, তাতে সংকল্প ছিল একটিই, না ঐ রকম চেহারা হবে নি, ছবি ভালো কি মন্দ তা আজও আমার সংকল্পের মধ্যে নয়। আমার সংকল্প হচ্ছে চেহারাটি আলাদা হোক।'[১০]

তাঁর ছবির অন্যতম বিষয় হল নারী। কখনো কল্যাণকামী, কখনো যৌবনে পূর্ণ তন্বী রূপে নারী তাঁর চিত্রে রূপ পেয়েছে। শ্রম, শক্তিতে পূর্ণ পুরুষেরাও সমান ভাবে তাঁর ছবিতে উপস্থিত। বাবুরা হাতি বা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন, কখনো আরাম কেদারায় বিলাসপ্রিয় ভঙ্গিতে তাদের অবস্থান। তিনি চিরকাল বৈষ্ণব মনের। তাই রামায়ণ, মহাভারতের যুদ্ধ তাঁকে টানেনি। রামকে এঁকেছেন বনচারী মুনি হিসেবে। করুণাময়, দয়াময় রূপে যিশুকে বহু পটে রূপ দিয়েছেন তিনি।

মোটা অথচ সুদৃঢ় রেখা, কালীঘাটের পটের আভাস, দেশীয় রঙের ব্যবহার এবং রূপ রচনায় বাহুল্যতা বর্জন করে তিনি ফর্ম ও ডিজাইনের নিত্য নতুন পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। গ্রামের মানুষ, বাউল কীর্তনীয়া, কৃষ্ণলীলা এই সময় তাঁর চিত্রে স্থান পেয়েছিল। যামিনী রায় এখানেই থেমে থাকেননি। রেখা ও রঙকে আরো কীভাবে সহজ করা যায়, চিত্রপটের মধ্যে ছবির ডিজাইন আরও কীভাবে ব্যঞ্জনাময় হয় তারই খোঁজে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই পর্যায়ে তাঁর ছবিতে

'চিত্রপট ও রূপ রচনার ছন্দ ও ভারসাম্য বিশেষভাবে প্রাধান্য পেল। রূপ রচনা চিত্রপট ও ফ্রেমের মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে রইলো না। ফ্রেমকে অতিক্রম করে ছবি যেন অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। চিত্ররচনার এই বাহাদুরি তাঁর ছবিতে এক নতুন প্রসাদগুণ এনে দিয়েছে এবং দর্শককে এক অদৃশ্য রূপজগতের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'[১১]

যামিনী রায়ের চিত্রে চাষী, মজুর, বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে বা টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা, প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা ও মায়েরা—দেশের এই চিরপরিচিত মানুষগুলো 'যামিনী রায়ের দীর্ঘ্য পরিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতায় শুদ্ধ রূপান্তর'।

সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন বলে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁর কল্পনার কোন চিরন্তন বোধের অস্তিত্ব ছিল, স্থায়ী কোন সৌন্দর্যের বাসনা ছিল যার দ্বারা তিনি প্রতিনিয়ত চালিত হতেন। চিত্র শিল্পী গনেশ পাইন বলেছেন 'সব শিল্পীই শেষ পর্যন্ত এক স্থায়ী সৌন্দর্যের সন্ধান করেন যা প্রকৃতির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত রহস্যে নিহিত থাকে। দ্বন্দ্ব এবং বিকার যখন শিল্পীর একক চেতনায় সংহত হয়, সমসূত্রে গ্রথিত হয়, তখনই তিনি এক অবিচল চিত্রাদর্শের অধিকার পান। এই আদর্শ এমনই এক নিত্যবোধ যা দোলাচলকে প্রশ্রয় দেয় না। এহেন চিত্রাদর্শ যামিনী রায়কে আমৃত্যু উজ্জীবিত রেখেছে। এটি তাঁর প্রত্যয়ের বস্তু।'[১২]

যামিনী রায়ের শিল্পীসত্তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি একই ছবি কোন রকম পরিবর্তন না করে বহুবার আঁকতেন। এবং সুলভ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, 'আমি যে পোটো।' কিন্তু তিনি শুধুমাত্র পোটো হলে লোকশিল্পীর উর্দ্ধে কখনো উঠতে পারতেন না। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত 'যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে বলেছেন, 'তিনি শিক্ষিত শিল্পী, তিনি চিন্তাশীল শিল্পী ছিলেন। তিনি যা কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন সেগুলোকে তাঁর হার মাস—শাঁস করে নিজের শিল্প প্রতিভা দিয়ে এমন একটা শিল্পস্তরে তুলে দিয়েছিলেন যাতে তাঁর সই আর ঢং স্পষ্ট ছিল।'[১৩]

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ :

১। ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, বেঙ্গল পাবলিশার্সঃ স্বাক্ষর, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৩০৫।

২। যামিনী রায়ঃ তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক, বিষ্ণু দে,

আশা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৮।
৩। রূপতাপস যামিনী রায়, সম্পাদক প্রশান্ত দাঁ, আধুনিক শিল্পের দুই পুরোধার একজন, গণেশ হালুই, প্রথম প্রকাশ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮ কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫৩।
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮।
৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৮।
৬। যামিনী রায়ঃ তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক, বিষ্ণু দে, আশা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫।
৭। রূপতাপস যামিনী রায়, সম্পাদক প্রশান্ত দাঁ, প্রথম প্রকাশ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮ কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫৬।
৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫২।
৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৫।
১০। রূপতাপস যামিনী রায়, সম্পাদক প্রশান্ত দাঁ, প্রথম প্রকাশ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮ কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮৮।
১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৯।
১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০।
১৩। দেশ, শতবর্ষে যামিনী রায়, ১১ এপ্রিল ১৯৮৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৪।